

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : পোশাক শ্রমিক,

শাহাদাতের স্থান : আশুলিয়া, সাভার

শহীদের জীবনী

“বাড়ি গড়ার স্বপ্নে
থেমে যাওয়া জীবন”

১৯৮৪ সালের ২৮ জুলাই সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ছোট্ট গ্রাম ডুমরাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন মো. লেবু শেখ। গ্রামের এক প্রান্তে কাঁচা রাস্তাঘেরা টিনের ছাউনির ঘরে তাঁর শৈশব শুরু হয়। বাবা জোরতুল্লা শেখ ছিলেন একজন সাধারণ কৃষক, আর মা নাজমা বেগম সবুজা ছিলেন গৃহিণী। ছয় ভাইবোনের মধ্যে লেবু ছিলেন দ্বিতীয়, কিন্তু পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয় তাকেই প্রথম। শিশু লেবুর কচি হাত যখন খেলার জন্য বাড়ির উঠানে মাটি খুঁড়ছিল, তখনই সময় তাকে টেনে নেয় বাস্তবতার নির্মম পাঠশালায়। পরিবারে নিত্যদিনের অভাব-অনটন, ধান-চাল নিয়ে মায়ের চোখের জল, আর বাবার ক্লান্ত মুখছবি সবকিছুই ছোট্ট লেবুকে সময়ের আগেই বড় করে তোলে। জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণেই যখন হিমশিম খেতে হয়, তখন স্কুলের বই-খাতা যেন এক বিলাসিতা হয়ে দাঁড়ায়। অল্প বয়সেই তাকে স্কুলের চৌকাঠ পেরোনোর পরিবর্তে ঢুকতে হয় মানুষের দোকানে। শিখতে হয় মাল তুলতে, হিসেব করতে, আর কীভাবে মুচকি হেসে প্রয়োজনের তুলনায় কম খাবারেও পরিপূর্ণ থাকার ভান করতে হয়। কেউ হয়তো বলবে, সে ছিল এক ‘বঞ্চিত’ ছেলে, কিন্তু বাস্তবতা বলবে সে ছিল এক ‘সংগ্রামী’ মানুষ, যিনি জীবনকে আলিঙ্গন করেছেন নিজের মতো করে, নীরবে, কিন্তু অবিচলভাবে লেবুর বেড়ে ওঠা ছিল ধুলোমাখা মেঠোপথ আর ঘেমে ভেজা পোশাকে। গ্রামের হাটে দোকানের বয় হিসেবে কাজ করতেন তিনি। সেখানেই শিখেছিলেন মানুষের সঙ্গে কথা বলা, হাসতে শেখা, বিশ্বাস অর্জন করা। তার দিনগুলো কাটত কাজের মধ্য দিয়ে, আর রাতগুলো স্বপ্ন বোনায় যেখানে একদিন নিজের একটা ঘর থাকবে, মায়ের জন্য একটা ভালো বিছানা থাকবে, আর সংসারে থাকবে একটু শান্তি। তাঁর শৈশব-কৈশোর কোনো শিশুসুলভ বিলাসিতা পায়নি, পায়নি কোনো আলোর ঝলকানি। কিন্তু তিনি তবু হেরে যাননি। বরং দারিদ্র, বঞ্চনা আর একাকিত্বের মাঝেই গড়ে তুলেছিলেন এক সৎ, পরিশ্রমী এবং আত্মসম্মানবোধে ভরা চরিত্র। তাঁর বেড়ে ওঠা ছিল এক নিঃশব্দ লড়াইয়ের গল্প, যা প্রতিদিনই চলছিল সমাজের অবহেলিত এক প্রান্তে, চোখের আড়ালে।

কর্মজীবন ও স্বপ্ন

যার শৈশব কেটেছে দারিদ্রের আঁধারে, তার পক্ষে স্বপ্ন দেখা যেমন কঠিন, তেমনি তা পূরণ করাও হয়ে ওঠে এক বিশাল সংগ্রাম। মো. লেবু শেখ সেই সংগ্রামীদের একজন, যিনি জীবনের প্রতিটি ধাপ পেরিয়েছেন মাথা নিচু না করে, আত্মসম্মানের সঙ্গে, পরিশ্রমের ঘাম মুছে। কিশোর বয়সেই স্কুলের ব্যাগ ফেলে হাতে তুলেছিলেন শ্রমের বোঝা। মানুষের দোকানে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, পরে ঢাকার পোশাক শিল্পে ঢুকে পড়েন শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ মিছিলে। শত শত শ্রমিকের ভিড়ে লেবু ছিলেন এক নীরব কর্মী, যিনি দিনের পর দিন সেলাই মেশিনের শব্দে নিজের ভবিষ্যতের ছাপ একে গেছেন কাপড়ের পরতে পরতে। পোশাক কারখানার জীবন সহজ ছিল না। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কাজ, নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের চাপ, আর শ্রমের ন্যায্য মজুরি না পাওয়ার যন্ত্রণা সবকিছু সয়ে নিয়েও লেবু হার মানেননি। তিনি জানতেন, তার প্রতিটি দিনের ঘাম জমা হচ্ছে এক স্বপ্নের কিস্তিতে। একদিন নিজের একটা ঘর হবে, যেখানে থাকবে শান্তি, নিরাপত্তা আর ভালোবাসার ছায়া। এই স্বপ্নের পথে এগিয়ে তিনি গ্রামের বাড়ির পাশে একটি নিচু জমি কিনে ফেলেন, বড় ভাইয়ের সঙ্গে মিলে। শুধু জমি কিনেই থেমে থাকেননি, প্রায় ৪০০ ট্রাক মাটি ফেলে জমিটিকে ভরাট করেন। কল্পনায় হয়তো তখনই দেখতে পেতেন ঘরের উঠানে মা বসে আছেন, স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে আদর করে পানি দিচ্ছেন বাগানের গাছে। হয়তো ভাবতেন দরজার সামনে নামাজ শেষে সূর্যের আলোয় ঝলমল করবে শান্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি। তার পরিকল্পনা ছিল, ২০২৫ সালের শুরুতেই ঘরের কাজ শুরু করবেন। কাঠামো হবে টিনের, মেঝে সিমেন্টের, কিন্তু স্বপ্নটা হবে কংক্রিটের চেয়েও বেশি শক্ত কারণ সেটি হবে তার শ্রমের উপার্জনে গড়া নিজের ঠিকানা। কিন্তু নিয়তির নির্মমতা মানুষকে সবসময় স্বপ্ন পূরণের সুযোগ দেয় না। অনেক স্বপ্ন যেমন চোখের পাতা বেয়ে বাস্তবের ধূলায় পড়ে যায়, তেমনি লেবুর স্বপ্নটাও পড়ে গেল রক্তের স্রোতে। সেই জমি আজও হয়তো পড়ে আছে, ঘরহীন, স্বপ্নহীন, কেবল বাতাস জানে, কতটা কষ্ট নিয়ে তা দাঁড়িয়ে আছে এক শহীদের অপেক্ষায়।

পারিবারিক জীবন

জীবনের ভাঙাচোরা পথে হাঁটতে হাঁটতে মো. লেবু শেখ একদিন পাশে পেলেন একজন জীবনসঙ্গিনী সেলিনা আক্তার। সন্তান না থাকলেও এই দম্পতির সংসার ছিল পরিপাটি, মমতাময়, আর পরস্পরের প্রতি আস্থায গড়া। সেটা কোনো ধনী পরিবার নয়, কোনো বিলাসিতার সংসারও নয় তবে তাতে ছিল আত্মিক শান্তি, শ্রদ্ধা আর হৃদয়ের নিঃশব্দ বন্ধন। সেলিনার জীবনও কম কষ্টের ছিল না। মাত্র তিন মাস বয়সে মা হারানো মেয়েটিকে বাবার স্নেহও দীর্ঘস্থায়ীভাবে জোটেনি। বাবার দ্বিতীয় বিয়ের পর নতুন সংসারে জায়গা না পেয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় খালার বাড়িতে। সেখানেই ধীরে ধীরে বড় হয়েছেন সেলিনা, খালার কোলে পাওয়া স্নেহটাই ছিল তাঁর একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু সেই আশ্রয়ও একসময় হারিয়ে যায় খালাও মারা যান। তখন, বিয়ের উপযুক্ত বয়স হতেই আত্মীয়স্বজনেরা সিদ্ধান্ত নেয় এই অনাথ মেয়েটিকে বিয়ে দিতে হবে, যেন অন্তত তার জীবনে একটি ঠাঁই তৈরি হয়। সেই আশ্রয় হয়েই এলেন লেবু শেখ। একজন সৎ, পরিশ্রমী এবং সংবেদনশীল পুরুষ, যিনি সেলিনাকে শুধু স্ত্রী নয়, একজন মানুষ হিসেবে সম্মান দিতেন। সেলিনা নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন, জীবনের অমানিশার পর এই মানুষটিই যেন এক নিঃশব্দ আলো হয়ে এসেছেন তাঁর জীবনে।

তাদের সংসার ছোট ছিল, কিন্তু শান্তিতে পূর্ণ। লেবু ছিলেন ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ পাঁচ ওয়াস্ত নামাজে নিষ্ঠাবান, কথায় মিতভাষী, চালচলনে সাদামাটা। জাগতিক লোভ-লালসা তাঁর জীবনে কখনো স্থান পায়নি। তিনি বিশ্বাস করতেন সৎ পথে পরিশ্রম করে খাওয়া ও নিজের ঘর বানানোই জীবনের আসল সফলতা। সেলিনা বলতেন, "লেবু খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। আল্লাহর পথে চলতে চাইতেন। কোনো রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না। সাধারণ জীবন কাটাতেন।" এই সাধারণত্বের মাঝেই ছিল অসাধারণ এক ভালোবাসা, একনিষ্ঠতা আর পারস্পরিক সম্মানের বন্ধন। সন্তান না থাকলেও তাদের দাম্পত্যজীবনে কখনো বিরক্তি কিংবা অভাব বোধ বাসা বাঁধতে পারেনি। বরং প্রতিটি দিন ছিল নতুন আশায় জেগে ওঠা, নতুন করে সংসার গড়ার স্বপ্নে পথ চলা। লেবু সেলিনাকে কখনো কষ্ট না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন মনের ভেতর। তিনি তাঁর সীমিত উপার্জন দিয়েই স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন প্রতিদিন। একসঙ্গে বাজারে যাওয়া, ঈদের দিনে নতুন জামা কিনে দেওয়া, আর মাঝেমধ্যে হাতে হাত রেখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন গড়া এটাই ছিল তাদের সুখ। সেই ঘর আজ নিঃসঙ্গ। সেলিনার জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো বড় শূন্যতা নেমে এসেছে, তবে এবার তা আরও কঠিন, আরও স্থায়ী। স্বামীর ছবি হাতে নিয়ে, হয়তো তিনি আজও ভাবেন যদি আরও একটু সময় পেতেন, তবে লেবুর সেই স্বপ্নের ঘরটা তারা একসঙ্গে গড়তে পারতেন।

জুলাই বিপ্লব ও আন্দোলনে যোগ

২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের ইতিহাসে সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায় যা আজ "জুলাই বিপ্লব" নামে পরিচিত। এটি ছিল নিছক কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়; বরং ছিল নিপীড়িত, অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার সাধারণ ছাত্র-জনতার আত্মচিহ্নকার। শহর থেকে গ্রাম, গার্মেন্টস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, রিকশাচালক থেকে ডাক্তার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ যেন এক কণ্ঠে বলে উঠেছিল: "এ বৈষম্য চলবে না!" এই আন্দোলন যেন হাজারো শোষিত মানুষের জমে থাকা দীর্ঘশ্বাসের বিস্ফোরণ, যুগপৎ অভিমান ও দ্রোহের বহিঃপ্রকাশ। এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ন্যায় অধিকার, মানবিক মর্যাদা এবং রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ। ঢাকার রাজপথ থেকে শুরু হয়ে আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামের চৌরাস্তার মোড়েও মানুষ জড়ো হয়ে দাঁড়ায় নিজেদের অধিকারের পক্ষে। এ আন্দোলন ছিল শ্রমজীবী মানুষেরও আন্দোলন। গার্মেন্টস শ্রমিক, দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষ যারা প্রতিদিনের রুটির জন্য ঘাম বারায়, অথচ তাদের কণ্ঠ কখনো রাষ্ট্রের কানে পৌঁছায় না তাদেরও ছিল এই বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। মো. লেবু শেখ ছিলেন এই শ্রমজীবী মানুষেরই একজন প্রতিনিধি। রাজনীতি নয়, কোনো দলীয় ব্যানার নয় তিনি এসেছিলেন অন্তরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একটা পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখা। একটা এমন বাংলাদেশ, যেখানে শ্রমিকের ঘামকে অবহেলা করা হবে না, যেখানে একজন সাধারণ মানুষও তার পরিবারের জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁই গড়তে পারবে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ঘোষিত "মার্চ টু ঢাকা" কর্মসূচি ছিল সেই আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় আহ্বান। হাজারো মানুষের সঙ্গে ঢাকামুখী যাত্রায় অংশ নেন লেবু শেখও। সাভারের আশুলিয়া থানার কাছাকাছি যখন মিছিল পৌঁছায়, তখন লেবু সেখানে ছিলেন সবার কাতারে। চোখেমুখে ছিল প্রত্যয়ের দীপ্তি, হৃদয়ে ছিল একটি মুক্ত সমাজের স্বপ্ন। তিনি কোনো রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না, ছিলেন না কোনো মঞ্চের বক্তা তবুও এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর, একান্ত। কারণ, এটা ছিল তাঁর মতো মানুষের জন্যই; তাদের স্বপ্নের জন্যই এই বিপ্লব। সেদিন তাঁর মনে কোনো ভয় ছিল না। ছিল না কোনো সন্দেহ। বরং লেবু বিশ্বাস করতেন আন্দোলনের, শক্তিই একদিন গড়বে ন্যায়ের সমাজ। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণের আগেই থেমে গেল তাঁর যাত্রা, যেন রাষ্ট্র নিজেই ভয় পেয়ে গুলি চালিয়ে থামিয়ে দিল এক গরিব মানুষের সাহসিকতা।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। বাংলাদেশের ইতিহাসে লেখা থাকবে এক রক্তাক্ত দিন হিসেবে। সে দিনের সূর্যও যেন উঠেছিল অশান্ত আকাশ ছুঁয়ে। চারদিকে উত্তেজনা, গুঞ্জন, আর আন্দোলনের ঢেউ। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসছিল 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে অংশ নিতে হৃদয়ে ছিল অধিকার ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশা, কণ্ঠে ছিল প্রতিজ্ঞার ঝংকার। লেবু শেখও সেই জনস্রোতের এক নীরব সৈনিক। কোনো দলের ব্যানার ছিল না তাঁর হাতে, ছিল না চোখেমুখে হিংস্রতা। শুধু ছিল বিশ্বাস এই পথচলা একদিন তার মতো হাজারো সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলে দেবে। তিনি ছিলেন আশুলিয়ায়, আন্দোলনের একটি মুখ্যস্থানে। পথ ছিল দীর্ঘ, ধুলোমলিন, তবুও মনে ছিল আশার আলো। তবে রাষ্ট্রের চোখে এ ছিল যেন অপরাধ। সকাল গড়িয়ে দুপুরের দিকে পুলিশ অতর্কিতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায়। রাজপথ মুহূর্তেই পরিণত হয় মৃত্যুপুরীতে। মানুষ ছুটোছুটি করে, চিৎকারে আকাশ ফেটে যায়, আর ধুলোর ভেতর ঢলে পড়েন লেবু শেখ পেটে গুলি লেগে রক্তাক্ত অবস্থায়। কোনো অ্যাম্বুলেন্স ছিল না, কোনো চিকিৎসার সুযোগও মেলেনি। গরিব মানুষের প্রাণ যে এত সহজে ঝরে পড়ে, রাষ্ট্র যেন তারই প্রমাণ দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় লেবু আর নেই। খবর ছড়িয়ে পড়ে সাভার থেকে রায়গঞ্জের ডুমুরাই গ্রাম পর্যন্ত। হৃদয় বিদারক কান্নায় ভেঙে পড়েন স্ত্রী সেলিনা, মা নাজমা বেগম, বড় ভাই ফজল হোসেন, আর সেই আদরের ভতিজা হাছান যাকে সন্তান হিসেবে গড়ে তুলছিলেন লেবু। লাশ আনার জন্য কোনো সরকারী সাহায্য মেলেনি। পরিবার নিজের টাকায় একটি পিকআপ ভাড়া করে তাঁর নিখর দেহ গ্রামে নিয়ে আসে। কোথাও ছিল না রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, কোথাও ছিল না কোনো দায়বদ্ধতা। পরদিন ৬ আগস্ট সকালে, গ্রামের কবরস্থানে জানাজা শেষে দাফন করা হয় শহীদ লেবু শেখকে। কোনো ময়নাতদন্ত হয়নি, হয়নি বিচার বা তদন্তের উদ্যোগ। শুধু একটি দুঃখ ভারাক্রান্ত দাফন যেখানে মাটি চাপা পড়ে এক গরিব মানুষের সব স্বপ্ন, ঘর তৈরির আশা, ভালোবাসার সংসার আর বেঁচে থাকার সাধ। তার মৃত্যুর মুহূর্তটি ছিল শুধুই একটি ঘটনা নয় তা ছিল রাষ্ট্রের ন্যায়বিচারহীনতার নগ্নতম প্রকাশ, বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক সাহসী কণ্ঠের রক্তাক্ত পতন।

নিকটাত্মীয়দের অভিমত

লেবুর বড় ভাই ফজল হোসেন বলেন, "ভাই হারানোর কষ্ট বোঝানো যায় না। সে নিজের সন্তান না থাকলেও আমার ছেলেকে নিজের ছেলের মতো করেই মানুষ করছিল।" তার ছেলে হাছান বলেন, "আমি তাকে 'আবু' আর চাচিকে 'আম্মু' বলে ডাকতাম। ঘটনার দিন চাচা বারবার ফোন দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। পরে খবর পাই তিনি শহীদ হয়েছেন।"

স্ত্রী সেলিনা বলেন, "আল্লাহ আমার কপালে সুখ রাখেননি, তাই স্বামীকে অসময়ে নিয়ে গেলেন। এখন শুধু একটাই চাওয়া তিনি যেন জান্নাতবাসী হন।" তিনি আরও বলেন, "যারা আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন, তাদের সবাইকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।"

লেবুর মা নাজমা বেগম কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "ছেলেকে কিছু দিতে পারিনি। সেই ছেলেকে গুলি করে মেরে ফেলল। আমার বুক খালি করে দিল। আমি বিচার চাই।"

শহীদ-পরবর্তী জীবন ও সহায়তা

শহীদ হওয়ার পর সেলিনা ফিরে যান তার বাবার বাড়ি, জামালপুরে। জীবনের প্রতিটি দিন কাটছে অনিশ্চয়তা আর বেদনার সঙ্গে। পরিবারের দাবি, সেলিনার একটি চাকরি নিশ্চিত করলে হয়তো সে তার জীবনটা কিছুটা হলেও টেনে নিতে পারত। সরকারিভাবে এখনও কোনো স্থায়ী সহায়তা পাওয়া যায়নি, যদিও কিছু সংগঠন ও দল এগিয়ে এসেছে। জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে ৫ লাখ টাকা এবং জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ২ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই

টাকা সেলিনা ও শাওড়ি ভাগ করে নিয়েছেন। ঈদের আগে জেলা প্রশাসক, ইউএনও ও বিএনপির পক্ষ থেকে কিছু ঈদসামগ্রীও পেয়েছেন তারা। এছাড়া আশুলিয়া থানায় দায়ের করা মামলায় ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ৩০০-৪০০ অজ্ঞাত ব্যক্তি আসামি করা হয়েছে।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

পূর্ণ নাম : মো. লেবু শেখ

জন্ম : ২৮ জুলাই ১৯৮৪

পেশা : পোশাক শ্রমিক

পিতা : জোরতুল্লা শেখ (মৃত)

মাতা : নাজমা বেগম, গৃহিণী

স্ত্রী : সেলিনা আক্তার, বয়স: ২২, গৃহিণী

স্থায়ী ঠিকানা : ডুমরাই, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

ধর্মীয় পরিচয় : ধর্মপ্রাণ মুসলমান, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন

পরিবার : স্ত্রী সেলিনা আক্তার, সন্তানহীন

আন্দোলনে যোগ : 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি, ৫ আগস্ট ২০২৪

শহীদ হওয়ার স্থান : আশুলিয়া, সাভার

দাফন : ৬ আগস্ট ২০২৪, নিজ গ্রামে

সহায়তা : জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন, জামায়াতে ইসলামি, কিছু স্থানীয় সহায়তা

পরিবারের দাবি : রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদ স্বীকৃতি, সেলিনার চাকরির ব্যবস্থা, বিচার নিশ্চিত করা

অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা

১। "লেবু শেখের স্ত্রী সেলিনা আক্তারকে পুনর্বাসনের জন্য একটি সরকারী চাকরি বা মাসিক ভাতা প্রদান করা প্রয়োজন।"

২। "পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য তাদের নামে সরকারি অনুদানে একটি ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করা উচিত।"

৩। "শহীদ লেবু শেখের পরিবারকে স্থায়ীভাবে সহায়তা দিতে একটি বিশেষ কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান দেওয়া যেতে পারে।"

৪। "জুলাই শহীদদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা জরুরি।"